শিক্ষা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে শিক্ষার হার যত বেশি, সেই দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত বেশি অগ্রসর। বৈশ্বিক উন্নয়ন রূপরেখা-২০৩০ বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) আওতায় সেই কারণেই শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এ লক্ষ্য অর্জনে জোর তত্পরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাসম্পন্ন গুণগত শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

২০০০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও ২০১৪ সালে বিশ্বব্যাপী ৯ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল। সমাজের সর্বোচ্চ ধনী ২০ শতাংশ পরিবারের শিশু এবং দরিদ্রতম ২০ শতাংশ পরিবারের শিশুদের পড়াশোনা করার দক্ষতায় ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ ও শহুরে শিশুদের মধ্যেও এ পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার বিবেচনায় ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর চিত্র বেদনাদায়ক। শিক্ষা ক্ষেত্রের এমন আশঙ্কাজনক বাস্তবতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেয়। মানসম্মত শৈশব উন্নয়ন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই ছেলে ও মেয়েদের প্রবেশগামিতা নিশ্চিত করে। প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষার বৈষম্য দূর করে সর্বস্তরের শিক্ষায় সবার, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া, অক্ষম ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। শিক্ষায় সুযোগ নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্ক ও যুব জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ভালো মানের চাকরি ও দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরির পরিবেশ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেয়।

সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৪-এর সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য বা সূচক রয়েছে, যার মধ্যে প্রধানত ২০৩০ সালের মধ্যে সব ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা; ২০৩০ সালের মধ্যে সব ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষায় সব নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সব পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী-পুরুষের বৈষম্যের অবসান ঘটানো। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয়, তা নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সব শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তা নিশ্চিত করা। শিশু, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধা নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সবার জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকার শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট কর্মসূচি ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো। এ সূচকগুলোর কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে সামনের দিকে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেন এবং এর পরপরই শৈশবকালীন শিক্ষাকে এ দেশে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং শৈশবকালীন শিক্ষা প্রসারে জোর দেয়া হয়। অতি সম্প্রতি ‘জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০’সহ সব শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে স্কুলকেন্দ্রিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় বহু আগে থেকেই ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিশু শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হলো শিশুদের স্কুল পরিবেশে অভ্যস্ত করে তোলা, যাতে তারা পরবর্তী সময়ে স্কুল ছেড়ে না দেয়। আনুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি সংস্থা ও এনজিও বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্নমুখী কর্মসূচি চালু করেছে। বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এগিয়ে নিতে ২০০৫ সালে সরকার, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক (বিইএন) নামে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অবস্থানের শিশুদের স্কুল অন্তর্ভুক্তিকরণ, ধারণ এবং জ্ঞানগত উন্নয়নে ভালো ফল দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এ থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে অতিদরিদ্র অবস্থান থেকে উঠে আসা শিশুরা।

২০০৫ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় মোট অন্তর্ভুক্তির অনুপাত বেড়ে চলেছে। ২০১৬ সালেও এ বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৫ থেকে ২০১৬ সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় মোট অন্তর্ভুক্তির হার (জিইআর) প্রায় তিন গুণ বেড়েছে এবং ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে জিইআর প্রান্তিক বেশি। ২০০৫ সালে ছেলে ও মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির হার ছিল যথাক্রমে ১০ দশমিক ৯ ও ১১ দশকিম ১ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩ দশমিক ৭ এবং ৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে মোট অন্তর্ভুক্তির অনুপাত ২০১৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ, যা ২০০০ সালে ছিল ১৭ দশমিক ১ শতাংশ। জিইআর ওপরে ওঠার ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি প্রধান পদক্ষেপ কাজ করেছে: এক. একটি জাতীয় পাঠ্যক্রম ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাড়তি ৩৭ হাজার ৭২৬ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান। দুই. তৃণমূল পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি ‘স্কুল শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা’ (এসএলআইপি) কাজ করছে। এ উদ্যোগের ফলে ২০১৩ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র অন্তর্ভুক্তির হার বার্ষিক ১ দশমিক ৪৫ শতাংশীয় পয়েন্ট হারে বাড়ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট বা নিট হিসেবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির আনুপাতিক হারকে লিঙ্গসমতা সূচক (জিপিআই) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যখন জিপিআই এর মান ‘১’ হবে, তখন ছেলে ও মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির হার সমান বলে ধরে নিতে হবে। জিপিআইয়ের মান ১-এর চেয়ে কম (বেশি) অর্থ হলো, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির অনুপাত কম (বেশি)। লিঙ্গসমতা সূচকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সব ক্ষেত্রেই জিপিআইয়ের মান ১-এর চেয়ে কম, যার মধ্যে নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে এর মান সবচেয়ে কম ছিল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে।

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে জিপিআই হিসাব করা হয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০১৭ কর্তৃক ব্যানবেইসে (বিএএনবিইআইএস) প্রদত্ত তথ্য থেকে। নতুন শতাব্দীর শুরুতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জিপিআই-১ ছাড়িয়ে গেছে এবং বার্ষিক কিছু ওঠানামা সত্ত্বেও ১-এর ওপরেই রয়ে গেছে। টারশিয়ারি বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন শতাব্দীর শুরুতে ১৯৯০ সালের চেয়ে জিপিআই প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। এত উন্নতি সত্ত্বেও ২০১৫ সাল পর্যন্ত এ স্তরের শিক্ষায় জিপিআই এখনো ১-এর নিচেই রয়ে গেছে। ২০১৬ সালের জিপিআই থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা তিনটি স্তরেই জিপিআই কিছুটা কমেছে। এর মানে হলো, এ সময়ের মধ্যে আগের বছরের তুলনায় মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের স্কুল অন্তর্ভুক্তি হয়েছে বেশি পরিমাণে। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে জিপিআই ২০০০ সালে ছিল শূন্য দশমিক ৩২০। ২০১৬ সালে এসেও বার্ষিক কিছু ওঠানামা মিলিয়ে এ কারিগরি শিক্ষার জিপিআই তার আগের মানের কাছাকাছিই রয়ে গেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো লাখ লাখ স্কুলবয়সী শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে। এদের স্কুলমুখী করতে সরকার কাজ করছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। সরকার নিরক্ষরতা, অদক্ষতা ও স্বল্প আয়ের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে বয়স্ক পুরুষ ও নারীর জন্য বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শুধু শিক্ষা কার্যক্রমের চেয়ে আয়নির্ভর শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন এনজিও, নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন সংগঠন প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে। সব অংশীজনের অংশগ্রহণের ফলে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ত্বরান্বিত হয়ে ৩৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৭ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ দশমিক ৯ শতাংশে, যার মধ্যে ৭৫ দশমিক ৭ শতাংশ ছেলে এবং ৭০ দশমিক ১ শতাংশ মেয়ে। নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হারের মধ্যে আগে বিদ্যমান বিরাট ব্যবধান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে এসেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার সম্প্রসারণে অবদান রেখেছে এমন মূল কারণগুলো হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার, সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ এবং সরকার ও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ।

শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে একটি নিরাপদ ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কিছু মৌলিক পরিষেবা ও সুবিধা প্রয়োজন। এর মধ্যে আইসিটি, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সুবিধা উপভোগ করার জন্য বিদ্যুৎ, অভিযোজিত অবকাঠামো, অক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য বই, স্কুল চলাকালীন ব্যবহারের জন্য সুপেয় পানি, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন এবং হাত ধোয়ার জন্য সাবান ও পানি অন্তর্ভুক্ত। সব স্কুলের এসব পরিষেবা ও সুবিধা থাকা উচিত। বর্তমানে ৮২ শতাংশ স্কুলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকলেও মাত্র ১ শতাংশেরও কম স্কুলে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সেবা রয়েছে। সারা দেশে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টার ফলে বিদ্যালয়গুলোয় পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে।

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিক্ষকরা। আদর্শিকভাবে সব শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তারা যে বিষয়গুলো পড়াবেন, সেগুলোয় খুব ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়ার সব ধরনের উদ্যোগ চালু আছে। প্রাথমিক স্কুলশিক্ষকদের অনুপাতে ২০১৬ সালে সি-ইন-এড (ন্যূনতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুপাত) ডিগ্রি বেড়ে দাঁড়ায় মোট শিক্ষকদের ৭৫ দশমিক ৫ শতাংশে, আগের বছর ২০১৫ সালে যে হার ছিল ৭৩ শতাংশ।

শিক্ষা খাতের বিস্তৃত অভীষ্ট হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতা উন্নয়ন, বৈষম্য কমানোর পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন করা। সরকার শিক্ষা খাতের লক্ষ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে ‘প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি)’ সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। পিইডিপি-৪ অনুমোদন করেছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য, যার লক্ষ্য হলো ২০১৭-১৮ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় গ্রেড ৬-১২ অর্জন করা। পাশাপাশি গ্রেড ১২-এর ওপর প্রযুক্তিগত এবং কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। শিক্ষা খাতের সংস্কারগুলো আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান টারশিয়ারি স্তরে উন্নতী করার অভিপ্রায়ে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

**সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাপূর্ণ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে ভবিষ্যৎ করণীয়:**

বাংলাদেশ প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে লড়াই করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক বিকাশ ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশ উচ্চ মাধ্যমিক আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে বিষয়গুলো ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। লিঙ্গসমতা ও শিক্ষায় অতীতে যে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে, তা টেকসই হতে হবে। সর্বস্তরের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

১. প্রাথমিক শিক্ষা ও মেধা উন্নয়নের জন্য সব বয়সী শিশুদের এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। এতে শিশুদের জন্য প্রাথমিক ও উচ্চস্তরে শিক্ষার সুযোগ বাড়বে। ২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মূল দৃষ্টিপাত হবে নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর: ক. বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, অঞ্চল, জাতি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থানের সব স্কুলবয়সী শিশুর জন্য স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করা; খ. ধী-শক্তি বৃদ্ধি এবং গ. যথাযথ পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদানের দক্ষতা, দক্ষ শিক্ষক নির্বাচন, চাকরির আগে প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নতকরণ। ৩. স্কুল পর্যায়ে শিক্ষক ও স্কুল কর্মকর্তাদের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে হবে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে ছাত্র-শিক্ষক ও স্কুলের কর্মদক্ষতার মান পরিমাপ, চাকরির আগে এবং চাকরিরত অবস্থায় শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, ছাত্র-শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জবাবদিহিতা ও অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ৪. টারশিয়ারি শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন—ক. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন; খ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; গ. ছাত্রদের মান উন্নয়নে পাঠ্যক্রম আপডেট করা; ঘ. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে উচ্চশিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন কমিশন (ইউজিসি) পুনর্গঠন; ঙ. পাঠ্যক্রম নকশায় বিশেষজ্ঞ, চাকরিদাতা ও বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন ছাত্রদের অন্তর্ভুক্তি এবং চ. গবেষণা ও উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, অভিজ্ঞতা বিনিময়, ইন্টার্নশিপসহ নানা উদ্যোগে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে একটি কার্যকর শিক্ষা-শিল্প সংযোগ স্থাপন; ছ. গুণগত মান নিশ্চয়তা পদ্ধতি বাস্তবায়ন; জ. কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের মাধ্যমে পদোন্নতি পদ্ধতি তৈরি এবং ঝ. দক্ষতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন চালু করে টিভিইটিতে কার্যকর করা। ৫. সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমানের গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন—ক. গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সক্রিয় গবেষণা পরিবেশ; খ. গবেষণার প্রয়োজনীয় এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থ তহবিলের নিশ্চয়তা; গ. আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গবেষণামূলক সহযোগিতা বৃদ্ধি; ঘ. বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং ঙ. প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব। ৬. জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রকৃতি ও ভূমিকা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। ৭. শিক্ষা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হবে এবং মন্ত্রণালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা হবে।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূত্রঃ bonikbarta.net